সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে শহীদ জিয়া

ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ

প্রভাব বিস্তারে তৎপর দলকানা বুদ্ধিজীবীশ্রেণি অথবা দেশের আগে দলকে স্থান দেয়া দলীয় কর্মীরা সামগ্রিকভাবে একটি জাতির রাজনৈতিক গতিধারা নির্ধারণ করে না। বরং যে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ নাগরিকের ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিই জাতির রাজনৈতিক বিবর্তনে ও ভাগ্য নির্ধারণে নিয়ামক ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে কোন দৃষ্টিতে দেখে এসেছে সেটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নিচে একটি ব্যক্তিগত মূল্যায়ন সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

একজন সাধারণ বাংলাদেশির কাছে শহীদ জিয়া ছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতীক, দুর্যোগের সময় জাতির ত্রাণকর্তা, বহুদলীয় গণতন্ত্রের পতাকাবাহক, এবং এমন একজন জননেতা যিনি তাঁর একক প্রচেষ্টায় জাতিকে প্রগতি, উন্নয়ন ও বহুমাত্রিকতার পথে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

জিয়াকে ঘিরে যে আখ্যান রচিত হয়েছে তার প্রথম পর্বটি মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। ২৫ মার্চ কালোরাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর গণহত্যা চালানোর লক্ষ্যে পরিচালিত 'অপারেশন সার্চলাইট'এর আওতায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এক বর্বর ও নিষ্ঠুর আক্রমণ চালিয়েছিল। তখনকার রাজনৈতিক নেতাদের অধিকাংশই এ রকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁদের অনেকেই রাজধানী ঢাকা বা দেশের বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান, অথবা স্বেচ্ছায় পাকিস্তানি সেনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এই কঠিন ও গোলমেলে পরিস্থিতিতে ২৬ মার্চ রাতে বেতারের মাধ্যমে ভেসে এসেছিল সৈনিক জিয়ার সাহসী কণ্ঠস্বর। কোটি কোটি উদ্বিগ্ন ও বিভ্রান্ত বাংলাদেশিকে এই ঘোষণা যার-পর-নাই আশ্বস্ত করেছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালানোর জন্য তারা এ থেকে প্রভূত অনুপ্রেরণা পেয়েছিল।

শহীদ জিয়ার আখ্যানের দ্বিতীয় পর্বটি মঞ্চায়িত হয়েছে অধিকৃত বাংলাদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে একজন সেক্টর কমান্ডার ও জেড ফোর্সের অধিনায়ক হিসেবে তিনি অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য তাঁকে জীবিত সৈনিকের জন্য সর্বোচ্চ সম্মান অর্থাৎ 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম উপ-প্রধান পদেও তাঁকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, যখন একটি সদ্য-স্বাধীন দেশে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

জিয়ার জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পর্বের সূচনা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে। তৎকালীন বাকশাল সরকার কর্তৃক গণতন্ত্র ধ্বংস ও একদলীয় শাসন-ব্যবস্থা চালুর পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থান শেখ মুজিব সরকারকে উৎখাত করেছিল। এরপর ৩ নভেম্বরে ঘটা আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ও খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার অপসারিত হয়েছিল। এ সময়ে সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে অভ্যুত্থানকারীরা বন্দি করে। তবে এবার ছিল সিপাহি-জনতার পালা, যারা সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে দেশে একটি বিপ্লব ঘটায়। এর মাধ্যমে স্বাধীনতার বীর সেনানী জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা হয়, এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিদ্রোহ দমন শেষে রাষ্ট্রপতি সায়েমের অধীনে জেনারেল জিয়াকে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান দেখিয়ে এবং মাতৃভূমিকে নিরাপদ রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জেনারেল জিয়া এই নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত গণভোটে জয়ী হওয়ার পর ১৯৭৮ সালে তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ,ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তারপর ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত জাতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতিতে জিয়া বিশাল ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি বাকশাল সরকার কর্তৃক বিলুপ্ত বহুদলীয় গণতন্ত্র পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং রহিত করা মৌলিক নাগরিক অধিকারসমূহ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বাক্-স্বাধীনতা এবং সমাবেশ ও চলাফেরার স্বাধীনতা। ব্যক্তি-উদ্যোগকে উৎসাহিত করে ও রাষ্ট্রীয় খাতের লোকসান কমিয়ে তিনি জাতীয় অর্থনীতির পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। গণ-সাক্ষরতা, পল্লী বিদ্যুতায়ন, কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের সংস্কার, বনায়ন, খাল-খনন ও সেচ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন, এবং পরিবার কল্যাণ কর্মসূচির মতো যুগান্তকারী পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি দেশে এক আর্থ-সামাজিক বিপ্লব সাধন করেছিলেন।

জিয়ার আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামাঞ্চলের মানুষদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন। এ সময় সারাদেশে এক অভূতপূর্ব সামাজিক সংহতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যার ভিত্তি ছিল সততা, সত্যবাদিতা, দক্ষতা, এবং কঠোর পরিশ্রম। রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল, আর কোথাও এর ব্যত্যয় ঘটলে তার বিরুদ্ধে নেয়া হয়েছিল কঠোর ব্যবস্থা।

শহীদ জিয়ার সবচেয়ে বড়ো সাফল্য ছিল বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ইমারত নির্মাণ করা। এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ঐতিহাসিক বিবর্তনে অর্জিত বাংলাদেশের গর্বসমূহ ধারণ করা, নাগরিকদের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় সত্তা নির্ধারণ, পূর্ব-পুরুষদের অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি, ভাষা ও সংস্কৃতির গৌরব তুলে ধরা, এবং ধর্মীয় আদর্শ ও নৈতিকতার চর্চা। জোট-নিরপেক্ষতার বলয়ে থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির বিকাশ, অনুন্নত দেশসমূহের স্বার্থরক্ষা, এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস ও অবদানের জন্য জিয়া বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছিলেন।

কিন্তু যখন মনে হচ্ছিল সবকিছু সঠিক পথে এগুচ্ছে আর জাতি এক আর্থ-সামাজিক উল্লম্ফনের দিকে ধাবিত হচ্ছে, ঠিক তখনই ষড়যন্ত্রকারীদের অন্ধকার ছায়া চারিদিক ঢেকে ফেলল। ১৯৮১ সালের ৩০ মে প্রত্যুষে প্রেসিডেন্ট জিয়া চট্টগ্রাম সফরকালে একদন খুনির হাতে মর্মান্তিকভাবে শাহাদত বরণ করেন। এর পরের বছরই ষড়যন্ত্রকারী সেনাপ্রধান জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ মঞ্চে আবির্ভূত হন। তিনি বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত বিএনপি সরকারকে অপসারণ করে জোরপূর্বক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। তারপর শুরু হলো ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি, ও অসাধুতা দ্বারা পরিচালিত ও ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের মদতপুষ্ট স্বৈরাচারী এরশাদের দশকব্যাপী দুঃশাসন।

কিন্তু শহীদ জিয়ার উত্তরাধিকার বিএনপি'কে এ দেশ থেকে কখনো নির্বাসনে পাঠানো সম্ভব হয় নাই। ঢাকার শেরে-বাংলানগরের মানিক মিয়া এভিনিউতে তাঁর নামাজ-এ-জানাযায় ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিই প্রমাণ করেছিল দেশের জনগণ শহীদ জিয়াকে কতোটা ভালোবাসতো ও শ্রদ্ধা করতো। তাদের এই ভালোবাসা ছিল এমন এক মহান ব্যক্তির জন্য যিনি দেশ ও জনগণের কল্যাণে তাঁর সারাটি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। নাগরিকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপক অংশগ্রহণ আরও প্রমাণ করেছিল শহীদ জিয়ার দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগকে মানুষ কতটা গভীরভাবে অনুধাবন করেছে। জিয়ার মৃত্যু-সংবাদ যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল তখন দেশের বিভিন্ন স্থানে আবেগময় দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। গণ-মাধ্যম থেকে খেলার মাঠ, সংবাদ-পাঠক থেকে ক্রীড়াবিদ, মানুষ সর্বত্র কান্নায় ভেঙে পড়ছিল। সমগ্র জাতি যেন ঢাকা পড়েছিল শোকের এক বিশাল চাদরে। বাংলাদেশের ইতিহাসে দুঃখ, শোক, ও বেদনার এমন দৃশ্যমান বহিঃপ্রকাশ আর কখনো দেখা যায়নি।

শহীদ জিয়ার একই পথ অনুসরণ করে, এবং তাঁর অনুসৃত দেশপ্রেম, সততা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক বহুমাত্রিকতার আদর্শ ধারণ করে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ১৯৯১, ২০০১, ও ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধারাবাহিকভাবে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে। শত প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে এবং বছরের পর বছর রাষ্ট্রীয় নিষ্পেষণ ও নির্মমতার শিকার হওয়া সত্ত্বেও ফিনিক্স পাখির মতো দলটির বারবার উত্থান ঘটেছে।

শহীদ জিয়া সম্পর্কে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ধারণা কখনো বদলায়নি। তারা খুব সহজেই সাদা ও কালো, সত্য ও মিথ্যা, আসল ও নকলের পার্থক্য বুঝতে পারে। যারা ক্ষুদ্র দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থে ইতিহাস বিকৃত করে ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তাদেরকে সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য এই গণমানুষেরা সর্বদা প্রস্তুত থাকে। স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী শাসন প্রত্যাখ্যান করে এবং তত্ত্বাবধায়ক ও

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদীয় নির্বাচনসমূহে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে বারবার নির্বাচিত করার মাধ্যমে দেশের জনগণ এটা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করেছে।

#

লেখকঃ অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রাক্তন উপ প্রেস সচিব।

পিআইডি ফিচার